ঢোঁড়াই চরিতমানস : ব্যক্তি-সমাজ ও রাজনীতিভাবনা

মোমেনুর রসুল*

সারসংক্ষেপ : ব্যক্তির জীবন ধারণের প্রশ্নে সমাজ যেমন গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ, তেমনি সমাজে বসবাসরত ব্যক্তির সার্বিক কল্যাণ সাধনে রাজনীতির ভূমিকাও প্রাসঙ্গিক। সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) *ঢোঁড়াই চরিতমানস* (১৯৪৯-১৯৫১) বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত বিহারের গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষের জীবন অবলম্বনে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাত নিয়ে রচিত যেখানে লেখক বদলাতে থাকা পরিবেশ আর মানুষের বিবর্তনকথা তুলে ধরেছেন। এই বদলের কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের মানসজগতের বিবর্তন। সেই বিবর্তনের সূত্রে উঠে এসেছে তার সমাজ ও রাজনীতির অভিজ্ঞান। দুটি চরণে ও সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত উপন্যাসটি মূলত ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের জীবনযাত্রার আখ্যান হলেও, গোষ্ঠীমানুষের মাধ্যমে শাশ্বত জীবনসত্যই প্রতিফলিত হয়েছে। ঢোঁড়াই বিহারের অনুন্নত নিম্নবর্গের সমাজে প্রতিপালিত হয়েই অবলোকন করেছে সে সমাজের সমস্যা। উপন্যাসে বর্ণিত তাৎমাদের জীবনযাত্রার পটভূমিতে ঢোঁড়াই-এর জন্ম, বেড়ে ওঠা, বিকাশ ঘটলেও অনগ্রসর তাৎমাটুলির প্রচলিত নিয়ম, অভ্যস্ত সংস্কার ভেঙে সে ধাঙড়টুলিতে গিয়েছে রোজগারের সন্ধানে। শৈশব থেকেই ঢোঁড়াই সমাজে থেকেও স্বতন্ত্র। পিতৃহীন, মাতৃ-পরিত্যক্ত ঢোঁড়াই প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ক্রমশ সমাজ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের প্রথম চরণে তাৎমা সম্প্রদায়ভুক্ত ঢোঁড়াইয়ের জীবনে তার পরিবেশের প্রভাব যেমন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, তেমনি এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে কিভাবে সে রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো — সেই রাজনৈতিক প্রভাবও উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে সমানভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে সতীনাথ ভাদুড়ীর *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে বিধৃত ব্যক্তি-সমাজ ও রাজনীতিভাবনার বিভিন্ন প্রান্ত বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ঠতম রাজনীতি আশ্রয়ী উপন্যাস *ঢোঁড়াই চরিতমানস*। ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে তিরিশ-চল্লিশের দশকে সংঘটিত বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন সমাজে একেবারে নিম্ন অন্ধকারময়, অজ্ঞ স্তরে কিভাবে প্রভাব ফেলেছিল এবং সেই প্রভাবে নিম্নবিত্ত মানুষের সমাজ ও ব্যক্তিজীবন কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল তার চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে এ উপন্যাসে। কেবল নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-জীবিকা, অভাব অনটনের দুঃসহ বিবরণ, অপরাজেয় সত্তা বা চিরন্তন সংগ্রামশীলতার প্রতিচ্ছায়াই নয়, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস সর্বোপরি সকল

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিসদৃশ চিন্তা-চেতনার স্পষ্ট দলিল হিসেবে *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসের সার্থকতা সুবিদিত। সতীনাথ ভাদুড়ী এ উপন্যাসে একই সঙ্গে সমাজতত্ত্ববিদ ও নৃতাত্ত্বিকের ভূমিকা পালন করেছেন। উপন্যাসের কাহিনিস্রোতে একটি নিম্নবর্গীয় জনপদের ভূ-নৃতাত্ত্বিক পরিচয় শিল্পিত হয়েছে। বিহারের ‘জীর্ণারণ্য’ বা জঙ্গলসদৃশ শহর জিরানিয়ার শহরতলি এ উপন্যাসের পটভূমি। শহর থেকেও মাইল চারেক দূরে তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর প্রতিদিনের এবং চিরদিনের জীবনসংগ্রাম, জীবনাচরণ, জীবনাভিজ্ঞতা এ উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের মনোজগতে স্থান পেয়েছে। লেখক একজন পরিণত নৃতাত্ত্বিকের মতোই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। এই সামাজিক বিন্যাস ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলেই নায়ক ঢোঁড়াইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে। সংগ্রামী ঢোঁড়াইয়ের জীবনধারায় সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের অধিকার সচেতনতা, আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি এ উপন্যাসে বিধৃত হয়ে আছে যা পাঠককে বিস্মিত না করে পারে না। সতীনাথের অসামান্য লেখন দক্ষতায় ঢোঁড়াই হয়ে উঠেছে গণনায়ক, জীর্ণারণ্য পেয়েছে ভারতবর্ষের মতো ভূখণ্ডের পূর্ণরূপ। ঢোঁড়াই ও তার সমাজের মানুষের বদলে যাওয়ার স্বরূপ, অভিজ্ঞতাসঞ্জাত অধিকারবোধ, তাদের রামায়ণের প্রতি তথা সত্যের প্রতি অবিচল আস্থা ও গভীর বিশ্বাসবোধ পাঠককে এমন এক জায়গায় উপনীত করেছে যেখানে স্থান কাল অনুভূতিতে কেবলই প্রতিভাস হয়ে ওঠে ব্যাপ্তি আর বিশালতা। লেখক ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময়ের পরিধির মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তি ও সমাজের বিবর্তনকে জিরানিয়ার দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন। ব্যক্তি ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক উন্মোচনে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও কাহিনির ক্রমিক বিকাশে সতীনাথ তাৎমা-ধাঙড় সম্প্রদায়ের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিশ্বাস-সংস্কার-সংস্কৃতিকে যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের দুটি চরণেই সমাজ তার সামগ্রিক রূপ নিয়ে প্রকাশিত। যদিও এটি বিহারের এক বিশেষ অঞ্চলের প্রান্তবাসী মানুষের জীবনধারা, তথাপি লেখকের সৃজনশৈলী ও প্রকাশভঙ্গির গুণে তা সার্বজনীন হয়ে উঠেছে।

‘রোজা-রোজগার-রামায়ণ’ এই নিয়েই তাৎমাটুলির জীবনের অখণ্ড পরিচয় হলেও এই জীবনকে ঢোঁড়াই প্রথম থেকেই এড়িয়ে গেছে। বুদ্ধিমান ঢোঁড়াই সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এই জীবনের ভাঙাচোরা দিকগুলি, দেখেছে গ্রামীণ পঞ্চায়েত শাসনব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা। ব্যক্তি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে অর্জন করেছে কাজের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্কই সত্য; আর সবই মিথ্যে। ঢোঁড়াই আরো পর্যবেক্ষণ করে, সমাজে ছড়িদার-মহতোর প্রতিপত্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, চৌকিদার-এসডিও সাহেবদের অবস্থানও গান্ধীর আগমনে ‘পড়তির মুখে পড়ে যায়’। ঢোঁড়াই তার ক্রমপ্রসারিত দৃষ্টি দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে :

> কিছুদিন থেকে দুনিয়া দরকারের চাইতেও বেশি তাড়াতাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। ঘটনার পর ঘটনার আঘাত লাগছে তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে। জিনিসটা আরম্ভ হয়েছে হঠাৎ, কবে থেকে তা ঠিক মহতোর মনে নেই; এই ‘এক সাল দেড় সাল’ হবে আর কী।

লোকের মনে কিসের যে আগুন লেগেছে, কিসের যে স্রোত এসেছে চারিদিকে, মহতো তা বুঝতেই পারে না, তো তার সঙ্গে ভাল রাখবে কী করে? (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১২৪)

উপন্যাসে ব্যক্তি হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় রত ঢোঁড়াইকে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাৎমাদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবনদর্শনের সঙ্গে। তাৎমারা কুঁয়োর বালি তোলা এবং ঘরামির কাজ ব্যতীত অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ত নয় বলে ঢোঁড়াই যখন এই গোষ্ঠীর পেশাগত ধারণাকে ভেঙে পাক্কী মেরামতের কাজ করতে যায়, তখন তার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত বসে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের একটি বিশেষ রূপ। পাঁচজন বিশিষ্ট মানুষের হাতে গ্রামের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পালনের অধিকার দেয়ার প্রচলিত রীতির ভিত্তিতেই এ ব্যবস্থা পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা নামে পরিচিত হয়েছে। পঞ্চায়েতের সদস্যরা বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। এদের মধ্যে প্রধান যিনি, তিনি মহতো; অবশিষ্ট চারজন নায়েব। এই নায়েবরা স্বসমাজের প্রধানদের মধ্য থেকেই মনোনীত। তাৎমাটুলিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার যে চিত্রের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে, তা থেকে নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক অবস্থানগত স্বরূপ সহজেই অনুধাবন করা যায়। যেমন :

তাৎমাটুলিতে ‘পঞ্চায়েত’ নিত্যি লেগেই আছে — এর বৌ ওকে দেওয়া, কোন্ পক্ষের কোন্ ছেলেটা মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুখাগ্নি করে নিয়েছে, মৃতের বাড়ির বেড়া আর বাঁশগুলো পাবে বলে; কে জোর করে স্বামীর সাক্ষাতে তার স্ত্রীর কপালে সিঁদুর লাগিয়ে তাকে স্ত্রী বলে দাবি করেছে; আরও কত রকমের দৈনন্দিন জীবনের খুচরো মামলা। কিন্তু এতটা বয়স হল; ‘পঞ্চ’রা কখনও দেখেনি যে, জাতের ‘পঞ্চায়েতি’তে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে, আর সে আসেনি। কথায় বলে ‘পঞ্চ’ যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন্ ছার। এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার! এ অপমান পঞ্চদের পক্ষে অসহ্য। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৪৯)

গোষ্ঠীনির্ভর তাৎমা সমাজকে প্রতিহত করে ঢোঁড়াই ক্রমশ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ঢোঁড়াইয়ের জাগরণে পঞ্চায়েত প্রধান ধনুয়া মহতো সর্বাধিক বিচলিত হয়ে ওঠে। অশিক্ষিত, বহির্জগৎবিমুখ টোলার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ বিপদে-আপদে থানা-পুলিশ কিংবা কোর্টে যায় না, ছোটে পঞ্চায়েতে। ধনুয়া মহতোর মতো শক্তিধর ব্যক্তিকে ঢোঁড়াই ভয় পায় না তাই ধাঙড়দের সঙ্গে পাক্কীতে মাটি কাটার কাজে যোগ দিয়ে ঢোঁড়াই মহতো, নায়েব সমাজের প্রত্যেকের কাছেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। ‘এরপর থেকে ঢোঁড়াই-এর একক সংগ্রাম হয়ে ওঠে আরো কঠিন, ব্যক্তি হিসেবে হয়ে ওঠে আরো অস্থির, আরো চলিষ্ণু। পুরাতন সমাজকে অস্বীকার করে, সেই সমাজের মানুষদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ঘরে ছাড়লেও নতুনতর মানুষের প্রতি বিশ্বস্ত হয়ে নতুনতর সামাজিক দায়-দায়িত্বের অঙ্গীকারেই দৃঢ় হয়ে উঠতে হয়।’ (বারিদবরণ, ১৯৯১ : ৩২২-৩২৩)

মূলত জাত-ধর্ম নিয়ে এবং যাবতীয় সমাজ-বিরুদ্ধ বিষয়ের বিচার বিধান করাই পঞ্চায়েতের মূল লক্ষ্য হলেও এর অন্তরালে উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে অনেক সুবিধাবাদী মানুষ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করত। ঢোঁড়াই সমাজের এসব অনিয়ম আর বিশৃঙ্খল প্রতিবেশ অবলোকন করে সংগ্রামী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসে তাৎমাসমাজের বেশ কিছু প্রথার সঙ্গেও আমাদের পরিচয়ে করিয়ে দিয়েছেন সতীনাথ। যেমন : তাৎমা সমাজে বরপণের চল ছিল না, কন্যাপণ দিতে হতো। যারা কন্যাপণ দিতে পারে না তাদের বিয়ে হয় না। আমরা দেখেছি মধ্যযুগের কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ‘আখেটিক খণ্ডে’ নায়ক কালকেতু ‘তের কাহন কড়ি’ পণ দিয়ে ফুল্লরাকে বিয়ে করেছে। এখানে তাৎমাদের সাথে কালকেতুর আদিবাসী জীবনের চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তাৎমাদের বিয়েতে দেখা যায় :

তাৎমাদের বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ টাকা পায় বরপক্ষের কাছ থেকে। তাৎমাটুলির বুড়িরা বলে ‘আহা টাকার অভাবে বিয়ে করতে না পেরে বৌকাটা সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাৎমাদের ছেলেরা বিয়ে হলেই সাহেবদের মতো মা-বাপের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই ভয়ে বৌকার মা ভিক্ষায় জমানো আধলাগুলো একদিনও ছেলের হাতে দেয়নি। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৮)

শুধু তাই নয়, বিয়ের ক্ষেত্রেও কিছু নিজস্ব রীতি-নীতি আছে তাৎমা সমাজে। বিয়ের আগের দিন গোঁসাই জাগানোর গান গাওয়া হয়, বরযাত্রী এলে দুয়ার বন্ধ করে অশ্লীল গান পরিবেশিত হয়। পাঁচজন নারী মাটিতে সিঁদুরের পাঁচটি ফোঁটা দেয়। উপন্যাসে নাপিত ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিবাহপর্বে উভয়ের আঙুল চিরে রক্ত বের করে পানে লাগিয়ে খেতে বলে। এমনকি বর-বধূকে উখলিতে ধান ভানানো হয়, বিয়ের সময় চাল গণনাও চলে। মিসিরজির হাতে জোড়া চাল উঠলে নবদম্পতি সুখী, আর বিপরীত হলে অসুখী। স্বীকার্য এসব সংস্কারের মধ্যে এই সমাজের নিজস্ব রূপটি ধরা পড়েছে।

বিয়ের পর তাৎমা ছেলে মেয়েদের বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে থাকবার রেওয়াজ নেই। তাদের সমাজের কোনো বিধবা ইচ্ছা করলে পুনর্বার বিবাহ করতে পারে। উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনী স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়ে করে জীবন অতিবাহিত করে। তাৎমাদের মধ্যে কুয়োর বিয়ে দেবার একটি প্রথা প্রচলিত। সরকারি কুয়োর জলে বিয়ের পবিত্র কাজকর্ম হয় না বলেই কুয়োর বিয়ের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের প্রচলন আছে। আবার লোটা নিয়ে মাঠে যাওয়া কিংবা মইয়ে চড়া তাৎমা নারীদের পক্ষে খুবই নিন্দনীয় কাজ। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত উপন্যাসের সর্বত্র উল্লেখ রয়েছে।

লৌকিক জীবনে বিশ্বাসী তাৎমা সমাজের মানুষেরা কোনো অমঙ্গল হলে, তার আভাস তারা আগেই পেয়ে যায়। তাদের বিশ্বাস দেবতাদের ঠিক সময়ে পূজা না দিলে অভিশাপ দেয়, তার ফলে তাদের সমাজে অমঙ্গল নেমে আসে এবং নানারকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। সতীনাথ ভাদুড়ী তাৎমাসমাজের লোকমানসে ধৃত এই বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন :

> সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না। সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে। সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায়, তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে, কী অসুখ! কী অসুখ! 'বাই উখড়ানো'র ব্যারাম — বেঁহুশ জ্বর — ঝট্‌দে বিমার পট্‌দে খতম। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ২০)

অজস্র বিশ্বাস তাৎমাসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান। তারা বিশ্বাস করে তাৎমা পুরুষরা মসুর ডাল খেলে তাদের সহ্য হবে না, কুষ্ঠ হবে। অথচ প্রসূতি মা মসুর ডাল আহার করতে পারে। তারা জানে যে বর্ষার পূর্বে পেয়ারা খেলে জ্বর হয় আর আশ্বিনের পরে বাতাবিলেবু খেলে জ্বর হয়। এ জ্বর মারণজ্বর। আসলে অসুখ-বিসুখের যথার্থ কারণ নির্ণয় করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করে এই জনজীবন বিবর্তিত হয়েছে। ফলে সবকিছুর একটি আদিম ব্যাখ্যা তারা মনে মনে গ্রহণ করে নেয়।

খাদ্যের ব্যাপারেও তাৎমা সম্প্রদায়ের মানুষজন খুবই সচেতন। তারা বিশ্বাস করে দুধ তাদের জন্য নয়। দুধ খাবে সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা তথা রাজারা। সেখানে 'দুধ তো বাবুভাইয়াদের জন্য। তারা রাজা লোগ। পরমাৎমা তাদের দুধ খাওয়ার সামর্থ্য দিয়েছেন — 'মুড়ি খবরদার না, পেট খারাপ করে মুড়ি আর ঘর খারাপ করে বুড়ি' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৮৫)। এমনি বিশ্বাসে বিশ্বাসী এই জনজীবন। তাই দুধ ও মুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে এরা যে যথেষ্ট সচেতন উপন্যাসের কাহিনিতে সে পরিচয়ও মেলে।

তাৎমা সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করে যে, ভয় পেলেই কলেরা হয়। রামিয়ার মায়ের মৃত্যুর ঘটনা থেকে তেমনই দৃষ্টান্ত উঠে আসে — 'যা দেশ, লোকেরা ভয়-টয় পেয়েছিল বোধ হয় রাতে। ভয় না পেলে কখনও হৈজা হয়' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৬৩)। বস্তুত কলেরা রোগ সম্পর্কে এমনই বিশ্বাস তাৎমা সম্প্রদায়ের মানুষের মজ্জায় মিশে আছে। তাদের এই বিশ্বাস বহু দিনের যা তারা অস্বীকার করতে পারে না।

মানুষের মৃত্যুকে তাৎমা সম্প্রদায় স্বাভাবিক বলে মনে করলেও মৃত মানুষের শৌচ-অশৌচ বিষয়ে এরা সংস্কারাবদ্ধ। মৃত মানুষ সম্পর্কে এদের বিশ্বাস-সংস্কার স্মরণযোগ্য — 'মরাকে তারা মানুষের একটা অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। ... কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ দিতে হবে' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৪৫)। লক্ষণীয় কুকুর, গরু ও মানুষের মৃত্যুর উল্লেখে তাৎমা সমাজের সংস্কারের দিকটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন লেখক। লোকায়ত জীবনের এই সংস্কার আজও বাসা বেঁধে আছে।

তাৎমাদের জীবন আদিম মানুষের মতো। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আদিম জনজাতি যেমন দেবতানির্ভর, তাৎমারাও তেমনি গোঁসাইকে দেবতা বলে গ্রহণ করে। তাই প্রতিবছর তাৎমাটুলিতে দেখা যায় :

> গোঁসাই থানে যেদিন ভেড়া বলি হয়, সেদিন প্রতিবছর তার উপর গোঁসাই ভর করেন। সেই সময় সে ভেড়ার রক্ত কাঁচা খায়, মুখে গায়ে ভেড়ার রক্ত মেখে, সে হুঙ্কার ছাড়ে। সে কি আর করে? তার মধ্য দিয়ে গোঁসাই কথা বলেন। তার হাতের ঘেরটা দিয়ে ছুঁয়ে সে যাকে যা বলবে, তা ফলবেই ফলবে। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ২২)

ঢোঁড়াই চরিতমানস উপন্যাসের নাম চরিত্র ঢোঁড়াই তাৎমাটুলির সন্তান। সে সূত্রে এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে মূলত তাৎমাটুলির জীবনচিত্রই অঙ্কিত হয়েছে। তবে নিম্নবর্গীয় মানুষের সামগ্রিক চিত্র প্রতিফলিত হয়নি তাৎমাদের জীবনকথায়। সে অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতা দেবার জন্যই ঔপন্যাসিক ধাঙড়টুলিকে তাৎমাটুলির বিপরীত কেন্দ্রে স্থাপন করেছেন। নিম্নবর্গের আদিম জনজাতি তাৎমাদের ন্যায় ধাঙড়রাও লৌকিক সংস্কারের ওপর বিশ্বাসী। বাঙ্গাবাঙ্গী ধাঙড়দের দেবতা। তাদের বিশ্বাস এই দেবতাকে ঠিক সময় পূজা না দিলে অমঙ্গল নেমে আসবে। তখন তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মলিন হয়ে যায় — খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, ফলে সেই স্থানে তারা আর থাকতে পারে না। তাদের বিশ্বাস :

> হাসি খুশি-ভরা ধাঙড়টুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শনিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে। প্রথমটা কেউ লক্ষ্য করেনি। এত বড় অমঙ্গলের সূচনা ধাঙড়টুলিতে আর কখনও আসেনি। বাঙ্গাবাঙ্গীর নির্দেশ আছে পাড়ার বাঁশঝাড়ে ফুল ফুটলেই বুঝবে যে আকাল, না হয় দুঃসময় আছে। ঐ ফুলের ফসল ছোড়ো না। তাই দিয়ে রুটি তৈরি করে খাবে। তারপর বারো বছরের বেশি, সেখানে থেকো না — বারোবার গাছে তেঁতুল পাকুক। তারপর তল্পিতল্পা গুটিয়ে, নতুন জায়গায় গিয়ে বসবাস করবার কথা ভাবতে হবে। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১১২)

লৌকিক বিশ্বাসও যে কখনো ভয়ঙ্কর ও জীবনবিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অমোঘ নিয়তির মতোই এ কুসংস্কারকে মেনে শনিচরা ও তার স্ত্রীকে গ্রাম ছাড়তে হয়; কেননা ফুল যে ফুটেছে তাদের অলুক্ষণে বাঁশঝাড়ে; অভিশাপ বয়ে এনেছে সবার জন্য। রাতের অন্ধকারে সেই বাঁশঝাড় চরম আক্রোশে কুপিয়ে কাটলেও পরিত্রাণ মেলে না তাদের। পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, সমাজকে পেছনে ফেলে নিঃসম্বল, নিঃসহায় দম্পতি পথে নামে। অশিক্ষিত নিম্নবর্গের সমাজে কুসংস্কার যে কত তীব্র আর প্রবল হয়ে উঠতে পারে, এটি তার অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত।

নিম্নবর্গের মানুষ খুব সহজেই সবকিছু বিশ্বাস করতে জানে। তাৎমাদের কৌম জীবনে নানা লোকবিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। আর সে কারণেই তাৎমারা রেবণগুণীর মতো অসৎ ব্যক্তিকে মানে রোজা হিসেবে। অসুখে-বিসুখে, বিপদে-আপদে রোজাই তাদের নিরুপায়ী জীবনে একমাত্র অবলম্বন। তুক-তাক, জাদু-মন্ত্রে পারদর্শী রেবণ ওঝার প্রতিপত্তি তাৎমাসমাজে এত অধিক যে রেবণ যখন গানহীবাবার প্রতি লোহা মানে, তখন তার চাতুরি তাৎমারা বোঝে না। মাতাল, জাত লম্পট রেবণ জিরানিয়ার সহজ, সরল মানুষগুলোকে গ্রাস করেছে। তার মন্ত্রের জোরে ঢোঁড়াইয়ের জ্বর ভালো হয়েছে

আর এজন্য ঢোঁড়াইয়ের মাকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা সে লজ্জায় কাউকে বলতে পারেনি। এমনকি কন্যাতুল্য রামিয়াকে তার 'ডবকা' ছুঁড়ি বলে মনে হয়েছে — তাকেও ভোগ করতে চেয়েছে। শিক্ষাবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিহারের গ্রামীণ প্রান্তিক মানুষদের শোষণ আর প্রতারণার মাধ্যমে রেবণগুণী তার প্রতাপ, প্রতিপত্তি টিকিয়ে রেখেছে। আসলে নিম্নবর্গের মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়েছে রেবণগুণীর মতো অসংখ্য সুবিধাবাদী মানুষ। লোকের মনে ভীতির জন্ম দেয়াই তার জীবিকার্জনের একমাত্র উপায়। কলোনিয়াল সমাজে কপট ধর্মনেতারা যেমন নানা অলৌকিক ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে জনগণকে কেঁচো সদৃশ করে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তোলে, তাৎমাটুলির রোজার ভূমিকাও নিঃসন্দেহে তদ্রূপ। আলোচ্য উপন্যাসে এ ধরনের আর একটি উদাহরণ আছে বিসকান্ধার জাত ও জমির রাজ্য অংশে। বিধবা সাগিয়ার সম্পত্তির লোভে তাকে 'চুমৌনা' করতে চায় তার দেবর গিধর মণ্ডল। মোসম্মতের কন্যা সাগিয়ার তামাকের ক্ষেতের লোভে শেষ পর্যন্ত মোসম্মতকে ডাইনি প্রতিপন্ন করা হয়।

আপাতদৃষ্টিতে তাৎমাটুলির অধিবাসীদের সহজ-সরল মনে হলেও তাৎমাদের অভ্যন্তর সমাজ-সংগঠন বেশ জটিল। বাইরের রূপটাই তাদের একমাত্র নয়। তাদের বহুস্তরীভূত সমাজব্যবস্থা সুসংগঠিত এবং মহতো — নায়েবের[১] শাসনে-শোষণে শৃঙ্খলিত। বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসনে বৃত্তাবদ্ধ তাদের জীবন। দৃশ্যত সরল সে-জীবন অন্তর্গত বিন্যাসে যে বহুভঙ্গিম, তা অনুধাবন করা যায় নিম্নোক্ত বর্ণনাংশের মাধ্যমে :

> রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল আর প্রত্যেক বাড়িতেই আছে কুয়ো। তাই কোনোরকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানেনা কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।
> মেয়েদের না জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলে – গাঁয়ে আছে কেবল 'পঞ্চায়তি', আর 'পঞ্চায়তি' আর– পঞ্চায়তি। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৬)

তাৎমারা সাধারণত অলস ও কর্মবিমুখ। এ-কর্মবিমুখতা এরা অর্জন করেছে উত্তরাধিকারসূত্রে। অলৌকিক, অতিলৌকিক ও আধিভৌতিক বিষয়ে এদের আস্থা অবিচল। তাৎমাদের বিদ্যাবুদ্ধিবর্জিত জীবনজুড়ে রয়েছে কেবলই সংস্কারবুদ্ধি। তাদের বিত্ত নেই, চিত্তের জৌলুসও নেই, কিন্তু জীবনপথে আছে বিস্তর বিপত্তি। জীবনে তাদের অভাব আছে, অনটন আছে, অনশন-অর্ধাশন আছে; কিন্তু নিয়ম ছিন্ন করার তাগিদ নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর বুধনীর জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত যে-তথ্য উপন্যাসে প্রদত্ত হয়েছে তা লক্ষণীয় :

> বুধনী বিধবা ছিল প্রায় বছর দেড়েক। বর্ষা নামলেই শুকনো বকরহাট্টার মাঠ নতুন ঘাসে সবুজ হয়ে যায়। এর পর মাস কয়েক বুধনী ঘাস বিক্রি করে টৌনে। অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে পুবে। মাঘ মাসে বনো কুল, ফাগুন চোতে শিমুল তুলো, আর কচি আম, বাবুভাইয়াদের বাড়ি বিক্রি করে। এ দিয়ে পেট চালানো বড় শক্ত। অন্য কোনো রকম মজুরি করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। তার উপর ঢোঁড়াইটাও আবার ভাত খেতে শিখল, আস্তে আস্তে। দু দুটো পেট চালাতে বড় মেহনত করতে হয়। তাও চলে না। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৪)

প্রকৃতপক্ষে জিরানিয়ার মানুষগুলো স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সাধারণ হলেও তাদের সমাজকাঠামো যথার্থঅর্থে পিতৃতান্ত্রিক বলা যাবে না। বুর্জোয়া সমাজে নারী যেখানে ঋবপড়হফ ঋবী হিসেবে পরিলক্ষিত হয়, জিরানিয়ার নিম্নবর্গীয় সমাজে নারী পুরুষের একেবারে সমকক্ষ না হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বেশ উজ্জ্বল। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তারাও যুক্ত — শ্রম বিভাজনের বৈষম্য তাদের গৃহমুখী করতে পারেনি। তারাও আয়-উপার্জনে তাৎমা সমাজের অর্থনীতির অংশীদার। পুরুষের ওপর নির্ভরশীল নয় বলে 'ধানকাটনী থেকে ফিরবার পর ঝোটাহাদের একটু সমীহ করে চলতে হয়' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১০০)। এই সমীহটুকু পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট অর্থের জোরেই। নারীরাও সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতন কারণ, 'দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৭৬)। ধানকাটনী ছাড়াও সে সমাজের নারীরা বর্ষার পর ঘাস বিক্রি করে, ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শিমুল তুলা আর কচি আম বিক্রি করে। আর্থিক স্বাধীনতাই যে তাদের মর্যাদার চাবিকাঠি তা তারা বোঝে। আর অবগত বলেই তারা শ্রমবিমুখ নয়।

অভাব-অনটন আর অনিশ্চিত জীবন-জীবিকার কারণে তাৎমারা নবজাত মানবশিশুর আবির্ভাবে যেমন আনন্দিত হয় না, ঠিক তেমনি প্রিয়জনের মৃত্যুতে তারা বেদনা-বিচলিত হয় না। রামিয়ার মায়ের মৃত্যুর পর তাৎমাদের নিরাবেগ দার্শনিকতাসুলভ প্রতিক্রিয়াসূত্রে এ বক্তব্য অনুধাবন করা যায় :

> তাৎমারা এ খবরে বিশেষ হৈ- চৈ করে না। মরাকে তারা মানুষের একটা অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। কিন্তু জানোয়ার মরা, আর মানুষ মরায় তফাত কী! কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গুরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ মরলে ভোজ দিতে হবে; এই তফাত। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৮৩)

তাৎমাটুলিতে কারো মৃত্যু হলে মৃত্যুর তেরো দিনের দিন মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করা হয়। তাৎমারা এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নাম দিয়েছে 'তেরহাঁ'। উপন্যাসে হরখুর পিতা 'তেরহাঁ'কে উপলক্ষ করে যে বর্ণনাংশ পরিবেশিত হয়েছে, তার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে এর স্বরূপ বৈশিষ্ট্য। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নরসুন্দর ডেকে উপস্থিত লোকজনের মস্তক মুণ্ডিত করতে হয়, অনুষ্ঠিত হয় পঙক্তিভোজন। এ-সময় একখানি করে সরু বাঁশের বাতা পেতে দেয়া হয়। এর ওপর পা রেখে সবাই বসে উবু হয়ে এবং সম্পন্ন করে ভোজনপর্ব।

অন্ধকারকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন আলোর প্রয়োজন, সুখকে অনুভব করতে দুঃখ, তেমনি তাৎমাটুলিকে জানতে হলে দরকার হয় ধাঙড়টুলিকে চেনা। তাৎমাদের তুলনায়

ধাঙড়দের সমাজজীবন বেশ আধুনিক। এরা মূলত ছোট নাগপুরের বাসিন্দা। নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র, অশিক্ষিত ধাঙড় তাৎমাদের মতো গোষ্ঠীবদ্ধ নয়; এমনকি জগৎবিমুখও নয়। পরিবর্তিত জগৎ ও জীবনকে আপন করে নিতে তারা সংস্কারহীন। এরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিশ্রমী। পরিচ্ছন্নতাকে পেশার নিগড়ে আবদ্ধ না রেখে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে ধাঙড়রা নতুন দিনের পথে পা বাড়িয়েছে সর্বাগ্রে। বেশিরভাগ ধাঙড়ই খ্রিস্টান; তারা সাহেবদের বাড়িতে মালির কাজ করে, কেউবা কুলের ডাল থেকে আরম্ভ করে মৌচাক কাটার কাজও করে। পরিশ্রমী বলেই তাৎমাদের সঙ্গে তাদের বিবাদ নিত্যদিনের। তামাৎটুলির জীবনপরিবেশে বেড়ে উঠলেও এখানকার সনাতন আচারপদ্ধতি, আত্মধ্বংসী রীতিনীতি গ্রহণ করতে পারেনি ঢোঁড়াই। এজন্য পিতৃপুরুষের আচরিত প্রথা ও প্রচলিত সংস্কার পরিত্যাগ করে চিরবৈরী ধাঙড়দের অনুসরণ করে সে। তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইয়ের চৈতন্যের জাগরণ ও প্রসারণে ধাঙড়টুলির সমাজ ও পট-পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রে বিদ্রোহের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হতে থাকে; তাৎমা-ধাঙড়দের চিরকালের বিবাদ উপেক্ষা করে, বাওয়ার উপদেশ অমান্য করে, মহতো-নায়েবদের বিনা অনুমতিতে সে ধাঙড়টোলায় গিয়ে পাক্কী মেরামতের কাজে যোগ দেয়।

ধাঙড়দের মোড়ল বুড়ো এতোয়ারী; সমাজের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে তার সহজ-সরল-অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তাৎমাটুলির ধনুয়া মহতোর থেকে সে উদার, সংস্কারশূন্য। পসার, প্রতিপত্তি, রুজি-রোজগার হারানোর শঙ্কা তার নেই। কারণ সে নিজে সাহেবদের সোডা কোম্পানিতে কাজ করে — মোড়লবৃত্তির ওপর তাকে নির্ভর করতে হয় না। ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গেও তার বেশ সদ্ভাব। ঢোঁড়াইয়ের আস্তানায় অগ্নিসংযোগ হলে এতোয়ারী দলবল নিয়ে এগিয়ে গেছে তাদের 'সনবেটা'কে (ধর্মছেলে) উদ্ধার করতে। এমনকি ঢোঁড়াই-রামিয়ার বিয়ের সময় তাদের ঘর তৈরি করে দিয়েছে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। ধাঙড়টুলিতে বৃদ্ধ এই মানুষটি এখানকার জনসাধারণকে সমস্ত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে তুলতে ছিল সদা তৎপর। তাই মোড়ল হলেও চরিত্রটি গতানুগতিক হয়ে ওঠেনি।

তাৎমাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতি না থাকলেও উপস্থিত বুদ্ধিতে যে তারা কারো থেকে কম নয়, বাবুলাল চাপরাশির কর্মকাণ্ডে তার প্রমাণ মেলে। বৌকা বাওয়ার থানে আগুন দেয়ার অপরাধে পুলিশের ভয়ে তাৎমা মোড়লরা যখন প্রায় দিশেহারা, তখন বাবুলাল অপরাধের সত্যতা স্বীকার করে যুক্তি দিয়ে বলে যে, বাওয়ার ঘরের চালে শকুন বসেছিল, তাই সে আগুন দিয়েছে। কেননা ঘরে শকুনের আগমন ভয়ঙ্কর অমঙ্গলসূচক। মিথ্যে অথচ বিশ্বাসযোগ্য এমন কথায় তাৎমাসমাজের মানুষ বাবুলালকে সমীহ করে চলে।

উপন্যাসে দুটি অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সামাজিক অবস্থানকে নতুনভাবে চিনিয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তাৎমা ও ধাঙড় এই দুই সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন সতীনাথ ঢোঁড়াইকে কেন্দ্রে রেখে। শিক্ষা থেকে দূরে অবস্থান করা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশ সংক্রান্ত কোনো ধারণাই নেই। দেশের ভেতরেই অনেক দেশ তারা গড়ে নিয়েছে। যেমন : 'বঙ্গাল মুলুক', 'পশ্চিম মুলুক'। অঞ্চলের তারতম্য অনুযায়ী তাদের শ্রদ্ধারও রকমফের ঘটে থাকে। পশ্চিম মুলুকের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার ভাব আর বঙ্গাল মুলুকের প্রতি বিদ্বেষ ভাব। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের একটি ভঙ্গিমা এদের ভাবনায় পরিস্ফুট হয়। বিহারের মধ্যে অবস্থান করেও তাৎমাটুলি, ধাঙড়টুলির জনতা নিজেদের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে রেখেছে। বিহারের লোকসমাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। যে সমাজ ব্রাত্য, অশিক্ষিত, কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা নিপীড়িত, অবহেলিত; দুঃখ-যন্ত্রণা যাদের নিত্যসঙ্গী সেই সমাজকেই সতীনাথ তুলে এনেছেন উপন্যাসের মহাকাব্যিক বাস্তবতায়। লোকসমাজের প্রতি লেখকের প্রগাঢ় ভালোবাসা আছে বলেই তিনি তাদের জীবনকথার বিশ্বস্ত ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন। এ প্রসঙ্গে সতীনাথের ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা দেবকান্ত বড়ুয়া বলেছেন :

> গ্রামীণ জীবনের এমন সহজ সরল এবং অনুকম্পাশীল বর্ণনা আমি বেশি পড়িনি। চাষী-মজুরদের সুখ-দুঃখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করার ক্ষমতা তাদেরই হয় যারা চাষী জীবনের শরিক। সতীনাথ ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির বুদ্ধিজীবী, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল গরীবের হৃদয়ের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। তাই ঢোঁড়াই চরিতমানস বাংলা ভাষায় বিহারের জনমানসের আদি ও অকৃত্রিম আলেখ্য। (সুবল, ১৩৭৯ : ৪৫)

পঙ্কে জন্মানো পদ্মের মতোই তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াইয়ের অবস্থান। পঙ্কে জন্মালেও পদ্মের সৌন্দর্য তাতে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, তেমনি তাৎমাটুলির কদর্য পরিবেশে জন্মালেও ঢোঁড়াই তার স্বগোত্রীয়দের মতো কূপমণ্ডূক হয়ে থাকেনি। তার চরিত্রে সত্যনিষ্ঠা এবং বিদ্রোহ প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল। বাবার মৃত্যুর পর বাবুলালের সঙ্গে তার মায়ের বিয়ে সে কখনো স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। মায়ের প্রতি অভিমান বা বিতৃষ্ণাই তার বিদ্রোহের প্রথম সোপান। বৌকা বাওয়ার আশ্রয়পুষ্ট হলেও ভিক্ষাবৃত্তিকে সে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেনি। রাস্তা তৈরির জন্য মাটি কাটার কাজে ধাঙড়টুলির শনিচরাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ঢোঁড়াই তার সমাজের প্রথা ভেঙেছে। এই বহমানতার ধারা বেয়েই রামিয়া আসে তার জীবনে, যা তার জীবনধারাকে আরো বদলে দেয়। রামিয়াকে বিয়ে করে সে তার সমাজের তুলনায় আধুনিক মানসিকতার পরিচয় রাখে। সমাজের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে ভিন গাঁয়ের, ভিন গোত্রের এক মেয়েকে বিয়ে করে সে নিজ পছন্দকেই প্রাধান্য দেয়। নিম্নবর্গের হয়েও সে শ্রেণিগত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। মাথা নিচু করে কোনোরকমে বেঁচে থাকার স্বপ্নে বিভোর হয়নি, বরং নিজ গোত্রের তুলনায় কর্মে ও চেতনায় অগ্রসর হয়েছে বহুদূর। জীবনের সকল অসঙ্গতিকে

ঢোঁড়াই অতিক্রম করেছে তাৎমাটুলি ও ধাঙড়টুলির বৃহত্তর গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে।

তাৎমাটুলির সঙ্গে সবধরনের সংস্রব ছিন্ন করার পর ঢোঁড়াই উপস্থিত হয় বিসকান্ধার কোয়েরী সমাজে। তাৎমা ও ধাঙড় সমাজের সমান্তরালে ঢোঁড়াই বিসকান্ধার কোয়েরীদের সমাজবাস্তবতারও প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। তাৎমা ও ধাঙড় সমাজ থেকে আত্মগ্লানি ও নিঃসঙ্গতা নিয়ে এক রাত অর্ধেক দিন পাক্কী ধরে সে পৌঁছে যায় নতুন শহর বিসকান্ধায়। কোয়েরীরা জাতিগত ও অর্থনৈতিকভাবে বিহারের অনগ্রসর শ্রেণির অন্যতম, যদিও অনেকেরই নিজেদের জমি আছে, কৃষি তাদের পেশা। এখানকার কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় বসবাসকারী কোয়েরীদের জীবনযাত্রাও বেশ জটিল। জাতের দোহাই আর জমির প্রতি লোভ এখানকার নিম্নবর্গের জীবনসমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। এখানকার গ্রামীণ পরিবেশ পরিসরে দীর্ঘ, এমনকি এদের জীবন সরল বিশ্বাসে গড়া তাৎমাদের জীবন থেকে অনেক জটিল। 'মোসম্মতের খেদ' অংশে লেখক এ সমাজব্যবস্থার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

> গাঁয়ের প্রাণ গাঁয়ের দলাদলি। দিন কয়েকের মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়াঝাঁটির নাড়ীনক্ষত্র ঢোঁড়াই জেনে গেলে। বড় গ্রাম, অনেক দল, অনেক রকম স্বার্থ। বড়র নিচে মেজ, মেজর নিচে সেজ। এখানকার ব্যাপারটা তাই, তাৎমাটুলি থেকে অনেক বেশি জটিল। সকলেরই নজর মাটির উপর, জমির উপর। মাটির রস মরলে তাকায় উপরের দিকে, তারপর চোখ বুঁজে তাকায় আটপৌরে মহাবীরজীর দিকে।
>
> তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প করত কালেভদ্রে। কিন্তু এখানকার হাওয়াই অন্যরকম। এখানকার হাসিকান্না গল্প রঙ্গ তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে। অর্ধেক কথার সূক্ষ্ম মারপেঁচ ঢোঁড়াই ধরতেই পারে না। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৫০)

বিসকান্ধার নবতর জীবনব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে তাৎমাটুলির জীবনধারণ ও ধারণার সঙ্গে এখানকার রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। মেয়েদের অবস্থা এখানে অনেক উন্নত বলে, লোটা নিয়ে তারা মাঠে যেতে পারে। কোয়েরীদের সমাজে ক্ষমতার সমীকরণ যদিও তাৎমা-ধাঙড়দের চেয়ে অনেকটাই আলাদা। সেখানে পঞ্চায়েতের অস্তিত্ব থাকলেও ক্ষমতার কেন্দ্রে রয়েছে রাজপুত সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে বাবুসাহেব বচ্চন সিং। তাকে অতিক্রম করে ওঠার চেষ্টাটুকুও কোয়েরীদের কাছে ছিল চিন্তাতীত। তাই জনজীবনে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার প্রভাব ও শক্তি এখানে বেশ কম। জোতজমিনির্ভর সমাজে কোয়েরীদের মতো ঢোঁড়াইও চাষাবাদের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেয়। সাগিয়ার মা মোসম্মতের কাছ থেকে সে শিখে নেয় তামাকক্ষেত্র পরিচর্যার কাজ। অতীতস্মৃতি তাকে মাঝে মাঝে পীড়িত করলেও এ-জীবনে অতিদ্রুত অভ্যস্ত হতে শুরু করে সে; জমি আর ফসলের সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠিত হয় আত্মীয়তার যোগ। তাই :

> পৌষ মাসে একদিন শিলাবৃষ্টি হয়ে অর্ধেক তামাক পাতা ছিঁড়ে চিরুনির মতো দেখতে হয়ে গিয়েছিল। সেদিন সাগিয়ার আর সাগিয়ার মা'র সঙ্গে ঢোঁড়াইও এসে মাথায় হাত দিয়ে বসেছিল ভিজে ঠাণ্ডা ক্ষেতের মধ্যে। মন বদলাচ্ছে তার, বিসকান্ধার জিনিসের উপর মায়া বসছে। অথচ এই সেদিন তাৎমাটুলিতে শিলাবৃষ্টি হলে, তারা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেছে; সাগিয়াদের মুখের দিকে ঢোঁড়াই তাকাতে পারেনি সেদিন সংকোচে। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৫৩)

কোয়েরিটোলার মানুষেরা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত। এরা বিশ্বাস করে রামচন্দ্রের দেয়া টাকার মালা গলায় পরলে ভূত-প্রেত নজর দিতে পারে না। যাদের অবস্থা সচ্ছল তারাই এই চাঁদির মালা পরতে পারে। তাছাড়া এদের ধারণা পরমাত্মার দয়া না হলে এ মালা পরা যায় না। বস্তুত অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকেই হয়তো এরকম ধারণা তথা সংস্কারের জন্ম হয়। যা সেই সমাজেও বর্তমান। লেখক এভাবে তাৎমা সমাজের মতো একই সাথে কোয়েরিটোলার মানুষের বিশ্বাস সংস্কার ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে অঙ্কন করেছেন। আবার কোয়েরিটোলার মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস যে বিপদে রামচন্দ্রই তাদের উদ্ধার করেন। শুধু তাই নয় বিপদে সমস্যার পথও রামচন্দ্রই দেখিয়ে দেন। কেননা কথিত আছে — 'বিপদের সময় রামচন্দ্রজী কাকের মুখ দিয়ে পথের হদিশ পাঠিয়ে দেন' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১২৫)। এখানে কাকের মুখ দিয়ে সংবাদ পাঠানো লোক মানুষের মনে অনেক দিনের বিশ্বাস। তারা আজও বিশ্বাস করে কেউ মারা গেলে তার নিকট আত্মীয়কে প্রথম কাকই জানিয়ে দেয়। সেই ধারণা থেকেই সতীনাথ এ দৃষ্টান্তকে তুলে এনেছেন।

কোয়েরিটোলার মানুষেরা সমাজ সংস্কারের নিরিখে বাঁধা। এদের নিকাশ জমি বলে একটি জলাধার থাকে। সেখানে দশ রকমের কাজ হয়ে থাকে। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য — 'ওগুলো হলো তাদের সারা গাঁয়ের নিকাশ জমি। সকলের গরু মোষ জল খেতে যায় ঐ পথে। মেয়ে ছেলেরা যায় দরকার পড়লে নদীর ধারে আবরুতে, দশবিধ করম আছে নদীর ধারে। জানোয়ার মরলে ফেলতে হবে। ছোট ছেলেটা মরলে পুঁততে হবে, ঘর নেপবার মাটি আনতে হবে সেখান থেকে খুঁড়ে, তারই নাম নিকাশ' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৩৭)। প্রধানত লোক মানুষের সংস্কারের একটি দিককে লেখক এভাবে তুলে এনেছেন যা আজও পাড়াগাঁয়ে বর্তমান।

বিসকান্ধায় মাটির সংস্পর্শে এসে ঢোঁড়াই স্বল্পকালের ব্যবধানে চিনে নেয় এখানকার মাটির কাছাকাছি মানুষের শত্রুদের। তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করেছে। বিসকান্ধায় এসে সে সত্যিকারের শ্রেণি শোষকের পরিচয় পেতে শুরু করে। শ্রেণিগত ঐক্যের কারণে তাৎমাটুলির ঢোঁড়াইদাস বিসকান্ধার ভূমিহার শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা আর জীবনসংগ্রামের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বিসকান্ধা গ্রামের ভূমি মালিক বাবুসাহেব বচ্চনসিং-এর কাছ থেকে বীজ ধান আদায়ের আন্দোলনে কোয়েরীদের নেতৃত্ব দেয় ঢোঁড়াই। বচ্চন সিং-এর নিকট অধিকার

আদায়ের লক্ষ্যে কোয়েরীদের কাগজপত্র নিয়ে উকিল মোক্তারের সম্মুখীন হয় ঢোঁড়াই। সে দেখে দরিদ্রদের অধিকার আদায় সহজসাধ্য নয়; এমনকি বিচার চাওয়া রীতিমতো বিড়ম্বনার। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ধীরে ধীরে ঋদ্ধ হয়ে ওঠে ঢোঁড়াই। সতীনাথের যে বৃহৎ উপন্যাসের পরিকল্পনা ঢোঁড়াইকে ঘিরে আবর্তিত, সেখানে তাৎমাটুলির সীমিত পরিসরে তাকে আবদ্ধ রাখতে চাননি তিনি। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার তাই বলেন, 'সতীনাথ বুঝেছিলেন চাষবাসের বিবরণ ব্যতীত ভারতবর্ষকে প্রতিবিম্বিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ঢোঁড়াইকে স্থানান্তরিত করেছেন জমি ও চাষের রাজ্য বিসকান্ধায়।' (অশ্রুকুমার, ২০১১ : ২৩৮)

জমি জিরেত নিয়ে রাজপুত জমিদার আর কোয়েরী আধিয়ারদের মধ্যে সংঘর্ষ-সংঘাত নতুন কিছু নয়। উপন্যাসের এ অংশে বুড়ি মোসম্মতকে তার জমি, স্বামীর ভিটে থেকে উৎখাত করতে বাবুসাহেব আর গিধর মণ্ডল মিলে তাকে ডাইনি বলে প্রচার করেছে। ধীরে ধীরে কোয়েরীদের সঙ্গে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে যায় ঢোঁড়াই। ভূমিকম্পে কোয়েরী জনপদ বিধ্বস্ত হলে ঢোঁড়াইয়ের কর্মোদ্যোগ ও ব্যস্ততা বেড়ে যায় বহুগুণ। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত মানুষজনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশের জন্য জিরানিয়ায় আসেন মহাত্মা গান্ধী। তাঁর দর্শনপ্রাপ্তির জন্য জিরানিয়ায় উপস্থিত হয় ঢোঁড়াই, মোসম্মত আর সাগিয়া। প্রচণ্ড ভিড়ে মোসম্মত হারিয়ে গেলে সাগিয়াকে নিয়েই কোয়েরীটোলায় প্রত্যাবর্তন করে ঢোঁড়াই। এ অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোসম্মতকে উত্তেজিত করে তোলে গিধর মণ্ডল। মোসম্মতও ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ করে অনৈতিক অভিসন্ধি। ফলে ঢোঁড়াই সাগিয়াদের পরিত্যাগ করে চলে যায় বিল্টার বাড়ি এবং ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ হতে থাকে সমকালীন রাজনীতির বিচিত্র গতি-প্রকৃতির সঙ্গে। মূলত সাগিয়ার অন্তর্ধানের পর ঢোঁড়াইয়ের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটে।

তাই শুধু চাষবাসই নয়, উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে গান্ধীজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঢোঁড়াইকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করিয়ে সতীনাথ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গও পরোক্ষে উপস্থাপন করেছেন। শূন্যগর্ভ রাজনীতির অপপ্রয়োগ, লাডলীবাবুদের রাজনৈতিক অবক্ষয়, ক্ষমতা লোলুপতা, দল-উপদল, স্বার্থ-সংঘাত প্রভৃতি বিষয় ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের মাধ্যমে যেভাবে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেছেন তাতে উপন্যাসটি সমকালের রাজনীতির দলিল হয়ে উঠেছে। প্রথম চরণে লেখকের সমাজ-ভাবনা রাজনীতি-ভাবনা অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব পেলেও দ্বিতীয় চরণে রাজনীতিই মুখ্য কথাবস্তুতে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সমালোচক হিমবন্ত বন্দ্যোপ্যাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন:

> উপন্যাসটির প্রথম পর্বে রাজনীতি এসেছে সন্তর্পণে, এখানে এই উপন্যাসের প্রথম চরণে দারুণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে সাবঅলটার্ন জনজীবনের ডিটেল তুলে আনা হয়েছে। আঁকা হয়েছে সেইসব প্রান্ত মানুষের পোট্রেট — যাদের প্রতি মুহূর্তের টিকে থাকার নামান্তরই রাজনীতি। দ্বিতীয় চরণকে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক উপন্যাসের শিরোপা দিতে অবশ্য

> কারও কোনো দ্বিধা নেই। প্রথম চরণেই ঢোঁড়াইয়ের ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে গড়েপিটে নেওয়া হয়েছিল, যাতে দ্বিতীয় চরণে তাকে আদৌ অস্বাভাবিক লাগে না। সমস্ত ঘটনাচক্রকে মূলত সেই অভিপ্রায়ের তারে বাঁধা হয়েছিল। প্রথমাংশের সম্ভাবনাটুকু উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে সম্ভব হয়েছে শুধু। কিশোর ঢোঁড়াইকে ঘিরে তাৎমাটুলির মাপে ছোট ঘটনাগুলি যেভাবে আবর্তিত হত, পরবর্তীকালে প্রৌঢ়-পরিণত ঢোঁড়াইকে বেষ্টন করেছে কোয়েরীটোলার তুলনামুলকভাবে মাপে-বড়ো ঘটনা দুর্ঘটনাগুলি। সেই সঞ্চারপথ ধরেই ঘটনাচক্রে ঢোঁড়াই হয়েছে 'রামায়ণজী', ছোট ছোট লড়াইয়ের ময়দানগুলি বাড়তে বাড়তে সর্বভারতীয়তা লাভ করেছে। এইভাবে উপন্যাসের রাজনৈতিক আয়তন ও আততি প্রসারিত হয়েছে মাত্র– প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও কিন্তু ভরকেন্দ্রচ্যুত হয়নি। (দেবব্রত, ২০০২ : ১৭৮)

মূলত পঞ্চায়েতের সঙ্গে বিরোধিতা করে যে ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত; পরবর্তীসময়ে রাজনীতির জগতে প্রবেশ যেন তাকে আরো বেশি বলিষ্ঠ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাৎমাটুলিতে ঢোঁড়াই ব্যক্তিগত প্রতিপক্ষ হিসেবে বাবুলাল কিংবা সামুয়রকে দেখলেও কোনো সামাজিক প্রতিপক্ষ দেখেনি। ফলে ব্যক্তি হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা সংকীর্ণ পরিধিতে সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে বিসকান্ধায় ঢোঁড়াইয়ের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে বিস্তৃত পরিসরে। এখানকার সমাজ কাঠামো তাৎমাটুলি থেকে প্রাগ্রসর বলে তার জীবনধারা ও মনোজগতেও পরিবর্তন ঘটেছে দ্রুত। এক্ষেত্রে দুটো বড় ঘটনার অভিজ্ঞতা ঢোঁড়াইয়ের পরিবর্তনশীল মনোলোকে গভীর প্রভাব ফেলেছে। একটি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ১৯৩৪ সালে সংঘটিত বিহারের ভূমিকম্প; অন্যটি রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতযুক্ত বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন। 'ঘটনার এ জাতীয় ধাক্কায় যেমন বিভিন্ন চরিত্র পাত্রগুলিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ ঢোঁড়াই পেল, শ্রেণিস্বার্থের ধূর্ত কৌশলগুলি সে যেমন চিনতে শিখল — তেমনি ঐ বড় বড় ঘটনাদুটির আলোয় তার নিজেকে নানা পর্যবেক্ষণও নিবিড় হল' (সরোজ, ২০১২ : ৩১৪)। বিসকান্ধার জীবনে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার ভেতর দিয়ে ঢোঁড়াইয়ের সংগ্রামী সত্তা পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এখানে কোয়েরী ও রাজপুতদের সঙ্গে জমিজমাকে কেন্দ্র করে যেমন সংঘাত-সংঘর্ষ ঘটেছে তেমনি কংগ্রেসি রাজনীতির কার্যকলাপ, গ্রামে গান্ধীজির ভলান্টিয়ারদের কাজকর্ম, সত্যাগ্রহ, ভোট, প্রাদেশিক কংগ্রেসি মন্ত্রিসভার নীতি ও কার্যকলাপ, পরবর্তীকালে মন্ত্রিসভা থেকে অব্যাহতি, জেলার নেতা মাস্টারসাহেবের কথা, বাবুসাহেবের ছেলে লাডলীবাবুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়া, মহাত্মাজির নির্দেশ সত্ত্বেও পদত্যাগ না করে নিজের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষা, ভূমিকম্প-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির জন্য রিলিফ বিতরণে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষপাতিত্ব এবং প্রকৃত রিলিফ-প্রার্থী দরিদ্রদের বঞ্চনার ইতিকথাও উঠে এসেছে। তাৎমাটুলির সীমিত পরিবেশের বাইরে লেখক ঢোঁড়াইকে প্রতিস্থাপন করে তাকে উত্তর ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতিনিধি করে তুলেছেন। সঙ্গত কারণেই সমকালীন রাজনীতির সাহায্য তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। উত্তর ভারতের প্রধান আদর্শ হলো রামায়ণ; বিশেষ করে তুলসীদাসের

রাম চরিতমানস আর আদর্শ মানুষ হলেন রামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। তাই লেখককে ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে আদর্শ নায়কের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আরোপ করতে হয়েছে। এছাড়া রামায়ণ বা রামচন্দ্রের সঙ্গে সমকালীন রাজনীতিকে সংযুক্ত করে দেবার ঐক্যসূত্রও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এসময় গান্ধীজির উদাত্ত আহ্বানের মাধ্যমে গ্রামীণ ভারতবর্ষ যেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশ্বাস পেয়েছিল। রামরাজ্যের মতোই এখানেও প্রতিষ্ঠিত হবে ন্যায়, সত্য ও ধর্মের রাজত্ব — এটাই ছিল তাদের বিশ্বাস। গান্ধীর সত্যাগ্রহের আহ্বানকে তারা এভাবে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করেছিল। সমালোচক উদয়শংকর বর্মা বলেছেন :

> ভারতবর্ষের এক প্রান্তিক, নিঃস্ব ও নিরক্ষর মানুষকে দেশের একজন জাতীয় নায়ক হিসেবে সতীনাথ উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্যে তিনি বাল্মিকী 'রামায়ণ' ও তুলসীদাসী 'রামচরিত মানসে'র কাঠামোটিকে এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। সতীনাথ রামচন্দ্র এবং তুলসীদাস দুইয়ের সাদৃশ্যেই তাঁর উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ঢোঁড়াইকে গঠন করেছিলেন। ঢোঁড়াইকে জাতীয় বীর বা নায়কে উন্নীত করতে চেয়েছেন। ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে রামচন্দ্রের আদল; আবার জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর অনুগত সে। ফলে তন্ত্রিমাছত্রী ঢোঁড়াই উপন্যাসের শেষ পর্বে রামচন্দ্রজী অভিধায় ভূষিত। (উদয়শংকর, ২০০৮ : ৩৮)

উপন্যাসে নানা ঘটনার সূত্রে সমাজের বিভিন্ন জাতি এবং শ্রেণির সঙ্গে সংঘর্ষে ও সমন্বয়ে ব্যক্তি ঢোঁড়াই একাত্ম হতে পেরেছিল। অধিকার সচেতনতায় সামাজিক নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঢোঁড়াই অনুধাবন করেছিল রাজনীতির ভয়াবহ নগ্ন রূপ। সতীনাথ তাঁর ডায়রিতে লেখেন :

> Life of the hero and other men who are linked with him. Role of the society information and maintenance of the individual- and the circumstances which determined the place and behaviour of the individual. (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৪৬৮)

উপন্যাসে ব্যক্তি ও পারিপার্শ্বিকের দ্বান্দ্বিকতায় ঢোঁড়াইয়ের চরিত্র বিবর্তিত হয়েছে; তাকে রাজনীতির কলাকৌশলগত নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে গোত্রহীন, নিঃস্ব ঢোঁড়াই ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের জাতপাত, অর্থনীতি, রাজনীতি ও লোকজীবনচর্যার নানান স্তর অতিক্রম করে এক বৃহত্তর লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে। সুবিশাল জনগোষ্ঠী এবং অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে একটি সুষম ঐক্য নির্ণয় করে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে ঢোঁড়াই। আত্মপরিচয়হীন ঢোঁড়াই তার বুদ্ধি ও কৌশলের মাধ্যমে কেবল পারিপার্শ্বিক নয়, ভারতীয় জাতীয় জীবনের ধারাতেও নিজেকে মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ব্যক্তিক জীবনের শূন্যতার স্তর অতিক্রম করে ঢোঁড়াইয়ের যাত্রা চলতেই থাকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত। গতিময়তাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ 'দ্বন্দ্বে সংঘাতে যে গতি সৃষ্টি হয় তার প্রবাহ মৃত্যুর হিমস্পর্শের

আগে মুহূর্তের জন্যেও থামিয়ে দেওয়া যায় না' (হাসান, ১৯৮৯ : ৬৯-৭০)। ঢোঁড়াইয়ের গতি জীবনের বাস্তবতার দিকে। তাই রামিয়া কর্তৃক অপমানিত ও অবহেলিত হয়ে ব্যক্তিক অস্থিরতায় সে তাৎমাটুলি থেকে বিসকান্ধায় চলে গিয়েও নিজেকে অস্তিত্বশূন্য মনে করেনি। সামাজিক সচেতনতা ও প্রবল জীবনাসক্তিই ঢোঁড়াইকে একক ও বিদ্রোহী করে তুলেছে।

ঢোঁড়াইয়ের বিদ্রোহী চেতনার সংস্পর্শে এসে কোয়েরিটোলার মানুষ অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে তাদের জীবনের বঞ্চনা। তাই উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে বিসকান্ধায় গিয়ে ঢোঁড়াই সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তোলে। এ পর্যায়ে ভূমিমূল থেকে উঠে আসা ঢোঁড়াই ভারতবর্ষের বিশ শতকের প্রথম পর্বের ইতিহাসের এক সাক্ষী হয়ে ওঠে। স্বভাবজাত সরল বিশ্বাসেই মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলে যোগ দেয় এবং নিজেদের অধিকার আদায় করে নেবার চেষ্টা করে। এতদিন উচ্চবর্গের লোকেরা তাদের শাসন ও শোষণ করেছে, অত্যাচার করে তাদের জমি কেড়ে নিয়েছে, খাদ্যের অভাবে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে। ঢোঁড়াই তাই দলবল নিয়ে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে এই নিম্নবর্গের মানুষদের অধিকার আদায় করে নিতে চায়। এখানে এসে ঢোঁড়াই উপলব্ধি করে দল না থাকলে একা সংগ্রাম করে কিছু হয় না :

> তাকে একা পেয়েই না তাৎমাটুলির 'পঞ্চ'রা যা করবার নয় তাই করেছিল। এই একা লড়া যায় না বলেই লোকে জাতের দুয়োরে মাথা কোটে। তাই না বচ্চন সিং অন্য রাজপুতদের রোজ সন্ধ্যেবেলায় সিদ্ধির শরবত খাওয়ায়। বাবু সাহেব যায় মুসলমান ইনসান আলির কাছে। তাই জন্যেই না কোয়েরীরা ঢোঁড়াইয়ের মতো রামায়ণ না পড়া লোকেরও সাহায্য চায়। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৭৩)

গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন রামরাজ্য গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে রাজনীতির জগতে প্রত্যক্ষ প্রবেশ ঢোঁড়াইয়ের জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা ঘটায়। নীলগাই এর ঘটনা, বুড়হাদাদার ব্যাপারে বাবুসাহেবের বাড়ি সকলে মিলে চড়াও হবার ঘটনা, বিশেষত ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ-পরবর্তী পুনর্বাসনে নেতৃত্বদান, সত্যাগ্রহের সভা এবং লাডলীবাবুদের সুবিধাবাদী নীতির মধ্য দিয়ে সমাজশত্রুকে চিনতে শেখা — এসবই ঢোঁড়াইকে অবিস্মরণীয় করে তোলে। আর সমষ্টিমানসলোকের ক্যানভাসটিও হয়ে ওঠে মহাকাব্যোপম। বিসকান্ধার সমষ্টিলোক ঢোঁড়াইকে নিজের সাথে নিজের আত্মসমীক্ষা এবং দেশকে জানার আদর্শ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলির পরিচিত জগতের ফ্রেম ভেঙে পড়ে এখানে। অর্থাৎ রামায়ণের প্রচলিত ফ্রেম আর মেলে না; প্রতিস্থাপিত হয় রাজনৈতিক অনুষঙ্গ। বৃহত্তর রাজনীতির সংস্পর্শে জড়িয়ে ঢোঁড়াই অর্জন করে নবজীবনের আস্বাদ। যে গান্ধীজির বাণীস্বরূপ চিঠি বহন করে কোয়েরীটোলায় স্বেচ্ছাসেবক দল আসে, স্বল্পকালের ব্যবধানে তাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে ঢোঁড়াইদের মোহভঙ্গ ঘটে। দেশসেবার নামে লাডলীবাবুর সুবিধাবাদী কর্মতৎপরতা,

স্বেচ্ছাসেবক দলের রিলিফের জন্য তোলা চাঁদা আত্মসাৎ করে পলায়ন প্রভৃতি দেখে ঢোঁড়াই বুঝতে পারে রাজনীতির ভেতরের অন্ধকারময় রূপটিকে। 'ঢোঁড়াইরা শুধু সমকালকে চেনেনি, সমাজের শোষণ পীড়নকেই চিনতে শেখেনি, সেইসঙ্গে ভদ্র-শিক্ষিত মানুষগুলোকেও চিনতে শিখেছে' (স্বস্তি, ১৯৮৫ : ৬৯)। তাই জীবনের যথার্থ স্বরূপ সন্ধানে ঢোঁড়াইকে হতে হয়েছে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। দ্বিতীয় চরণে প্রকৃত অর্থে ঢোঁড়াই রাজনীতির বৃহৎ পরিমণ্ডলে নিজেকে তুলে ধরেছে। গান্ধীবাদীদের লবণ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ, বিয়াল্লিশের গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন আজাদ দস্তায় অংশগ্রহণ করলেও রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা ক্রমেই তার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে দেখে সর্বত্রব্যাপী মিথ্যাচার, শূন্যগর্ভতা, কথা ও কাজের অপরিমিত দূরত্ব। এমনকি আজাদ দস্তায় থাকাকালীন প্রতিটি মুহূর্তে সহযোদ্ধাদের লোভ-লালসা, স্বার্থপরতার পরিচয়ে এ পথের অসারত্ব ও আদর্শহীনতা সম্বন্ধে ঢোঁড়াইয়ের একটি সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়ে যায়। ভোপতলাল, বিশুন শুক্লা, বলন্টিয়ার, বাচিতরসিংদের বড় বড় নেতার নাম ব্যবহার করে পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে স্বার্থ-সিদ্ধি লাভের চেষ্টা প্রভৃতি দেখে ঢোঁড়াই ক্লান্তিতে-অবসাদে ডুবে থাকে। আবার এই নাম পরিবর্তন নিয়েই ঘনিয়ে ওঠে পারস্পরিক ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব। গ্লানি ও নৈরাশ্যে ভারাক্রান্ত হয় তার মন। মানসিক এই বিপর্যয়ে স্বস্তি পেতে, হতাশা থেকে শান্তির রাজ্যে উপনীত হতে তাই সে গান্ধীর দেয়া রামায়ণ পাঠে অগ্রসর হয়। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ঢোঁড়াই এক সর্বগ্রাসী নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হলেও তার অন্তহীন চলার পথ মন্থর হয়ে যায়নি। তাই রামায়ণের সূত্রেই আজাদ দস্তার নাম ক্রান্তি দল হয়ে গেলে সেই দলে ঢোঁড়াইয়ের ছদ্ম নাম হয় 'রামায়ণজী'। ক্রান্তিদল উত্তাল বিয়াল্লিশের সময়পর্বে নিষিদ্ধ, আত্মগোপনকারী একটি দল ছিল। এ দলের সদস্যরা বোমা, বন্দুক, কার্তুজ নিয়েই অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল সংগ্রামে। সমাজের উচ্চবিত্তদের ওপর চড়াও হয়ে ভয় দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে দল পরিচালিত হতো। কিন্তু এভাবে কার্যক্রম চালাতে গিয়ে ক্রান্তি বা 'কেরান্টি' যখন সাধারণ মানুষের নিকটও হয়ে উঠল ত্রাসসৃষ্টিকারী একটি নাম, উপন্যাসের শেষ অংশ জুড়ে যখন দলের এই অন্তঃসারশূন্য ও প্রতিক্রিয়াশীল রূপটি তুলে ধরলেন সতীনাথ; বোঝা গেল রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ঔপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই আসলে উন্মোচিত হয়েছে ঢোঁড়াইকে উপলক্ষ করে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, *ঢোঁড়াই চরিতমানস* উপন্যাসে সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের চরিত্রের বিবর্তনসূত্রে সম্পর্কযুক্ত। প্রচারমূলক রাজনীতির উপস্থাপন সতীনাথের উদ্দেশ্য নয়; তিনি মানুষের চেতনার পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক সত্য ঘটনা তুলে ধরেছেন এখানে। কংগ্রেসের বিয়াল্লিশের অহিংস আন্দোলন স্থানবিশেষে অহিংস থাকেনি তা পরিবর্তিত হয়ে ক্রান্তিদলের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়, তার সার্থক রূপ এখানে তুলে ধরেছেন সমালোচক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় :

> ঢোঁড়াই-এর চেতনার উৎসমুখ খুলে যায় ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজনিত ব্যবহারিক কাজে ঢোঁড়াই তার চেতনাকে নিজের মতো করে সংগঠিত করে, তাতে অবস্থা-পরিবর্তনের জন্য একটা চৈতন্য বা অনুধাবন ছিল। ৪২-এর আলোড়নে তারই রূপান্তর ঘটে। ঢোঁড়াই-এর নিজ চেতনা, লড়াইয়ের চেতনা, জগৎকে পাল্টাবার জন্য বোধ ধাক্কা খায় রাজনীতির বাস্তবে– মহাৎমাজীর দলেরই আভ্যন্তরীণ চিত্রে। বাইরে থেকে যে চেতনা ঢোঁড়াই নিতে চেয়েছিল তা বিরোধী হয়ে যায় তার চৈতন্যের সঙ্গে। (পার্থপ্রতিম, ২০১১ : ৮৩)

যে প্রান্তিক অঞ্চল থেকে উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের আবির্ভাব, সেই প্রান্তজনের প্রতিনিধি হিসেবে তার অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে ওঠা এক দুর্লভ ও ব্যতিক্রমী ঘটনা। আধিয়ারদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ঢোঁড়াই অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে কংগ্রেসের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে। তাদের মুখে 'ঢোঁড়াইজি' সম্বোধন শ্রুত হয়ে রোমাঞ্চিত বোধ করে সে। আত্মবিশ্বাস বাড়ে তার। স্বল্পকাল ব্যবধানে সে বুঝতে পারে সর্বসাধারণের মধ্যে তার জন্য তৈরি হয়েছে এক সম্মানজনক আসন। ব্রাত্যজনের একান্ত মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রামে ব্যক্তি ঢোঁড়াই যেমন সমাজের এক বিশেষ যুগচেতনার হৃৎস্পন্দনকে ধরে রেখেছে, তেমনি শিকড়ের সন্ধানে ফেরা ঢোঁড়াইয়ের হতাশাকাণ্ডে সমাপ্তির ইতিহাসও বাস্তব ও সময়ানুগ হয়ে উঠেছে।

ঢোঁড়াই চরিতমানস-এ ঢোঁড়াইয়ের জীবনের ক্রম উন্মোচনে শুধু রাজনীতি একমাত্র নিয়ামক শক্তি হয়ে ওঠেনি, এর মূলে ছিল গান্ধীর অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি তার অসাধারণ কৌতূহলও। মহাত্মা গান্ধী তার আদর্শ ও সততার দ্বারা সর্বসাধারণের কাছে সমকালে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। সুদূর বিহারের তুচ্ছ তাৎমাটুলি গ্রাম যে রাজনীতির সূত্রে ভারতবর্ষের মূল স্রোতের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিল, তার কারণ গান্ধীবাদের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। তাৎমাটুলির নিরাশ্রয়, শিক্ষাদীক্ষাহীন ঢোঁড়াই গান্ধীর আদর্শের মধ্য দিয়েই সংকীর্ণ পরিধির বাইরে বেরিয়ে এসে মুক্তি পেয়েছিল। তাই মহাত্মা গান্ধীর অন্তর্দৃষ্টিকে তার মনে হয় দৈবশক্তির মতো :

> গানহী মহারাজ, পুরনো গানহী বাওয়া হঠাৎ কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গিয়েছেন। মাস্টারসাহেবের বেটা কাল এসে মরণাধারের কাছে বলে গিয়েছেন যে 'রংরেজ' সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি 'সরকার' তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল। তারপর থেকেই তো তারা কাপড় বুনবার কাজ ভুলেছে। সাধে কি আর মহাৎমাজী 'রংরেজ'-এর নিমক খেতে বারণ করেছেন। সব দেখতে পান তিনি। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১২০)

ঢোঁড়াইরা যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছিল এর পেছনে কোনো রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা চেয়েছিল তাদের সামাজিক অধিকার, ফসল-মাটি-পারিশ্রমিকের অধিকার। লাডলী বাবুদের রাজনীতি যে প্রকৃতই স্বার্থান্বেষী এবং জনস্বার্থবিরোধী, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল ঢোঁড়াই। এমনকি গিধর মণ্ডলরা কীভাবে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে শোষণ করে নিজেদের ভাগ্যনির্মাণ করে, তাও বুঝতে বাকি থাকে

না তার। ফলে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের পথকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াই চরিতমানস উপন্যাসে সতীনাথ ১৯১২ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত সময়পর্বে সংঘটিত ভারতবর্ষের প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহকে নিম্নবর্গীয় জনতার দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। জননায়ক গান্ধীজি এই প্রান্তিক মানুষজনের বিশ্বাসে হয়ে যান সংসারত্যাগী নাঙ্গা সন্ন্যাসী 'গানহী বাওয়া', আর তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায় 'সতিয়াগিরার তামাসা'। দীর্ঘ ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এভাবেই বিস্তার পায় না-লেখা ছোট ইতিহাস। এ কারণেই 'জাতীয় আন্দোলনের বড় বড় ঢেউ তাৎমাটুলি পর্যন্ত আসতে আসতে তার প্রবল তেজ ধরে রাখতে পারে না' (অমিতাভ, ১৯৯৯ : ৬২)। সমালোচকের এই পর্যবেক্ষণ নির্মম সত্য হয়ে ওঠে যখন এই মানুষগুলো দেশের স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিজেদের যুক্ত করতে না পেরে একটি দূরত্ব থেকে এভাবে দেখে, 'বাবুভাইয়াদের কাংগ্রিস আর দারোগা হাকিমদের সরকার! এদের মধ্যে লেগেছে টক্কর।' (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ১৩২)

উপন্যাসে সতীনাথ ঢোঁড়াই চরিত্র বিকাশে ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে পর্বটিকে নির্বাচন করেছেন তা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, আগস্ট আন্দোলন পর্ব। তৃণমূল স্তরের জনমানসে সেই আন্দোলনের প্রচ্ছায়াকে এ উপন্যাসে ইতিহাসের মতো পাঠ করা যায়। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের বৃহৎ অংশের কিষাণ, মজুর, খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে স্বরাজ ও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যে বিপুল উদ্দীপনা তাদের অহিংস সত্যাগ্রহে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার বিবরণ ইতিহাসসম্মত। 'তারা সর্বস্ব পণ করে মহাত্মাজির পাশে দাঁড়িয়েছিল যতটা 'রংরেজ' তাড়াবার প্রেরণায়, তার চেয়ে বেশি বহুযুগলালিত বর্গীয় শোষণ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায়' (মননকুমার, ২০1৪ : ১৭২)। তবে নিম্নবর্গের এ পণসবর্স্ব মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি বাস্তবে। কংগ্রেসী আন্দোলনে তাদের আশাভঙ্গের যে স্বাক্ষর পাওয়া যায়, তার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে অরবিন্দ সামন্ত লেখেন :

> গান্ধীমিথ কেমন করে বিহারের নিম্নবর্গীয় আশা-আকাঙ্ক্ষায়, কামনা-বাসনায় দোলা দিয়েছিল, কেমন করে তারা গান্ধীর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ভাবনার সঙ্গে নিজেদের আঞ্চলিক উচ্চবর্গীয় শোষণমুক্তির ভাবনা যোগ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত কেমন করে তারা মহাৎমাজীর ব্রিটিশের শক্তি-পরীক্ষার সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য-পরীক্ষার খেলায় মেতেছিল তার সানুপুঙ্খ বিবরণ আছে ইতিহাসে। কিন্তু যা ইতিহাসে নেই, কিংবা তেমন করে নেই, তা হ'ল এই গান্ধী-মিথ যা নিম্নবর্গীয় কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল তা নিম্নবর্গের মধ্যেই কেমন করে ভেঙে পড়ল তার বিবরণ। গান্ধী মিথের বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে একটি বাক্যে সংহত করা যায় : কংগ্রেসী আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্ত করে নিম্নবর্গের আশাভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের বেদনা, এই বেদনার অন্তর্দর্শী সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা, এই সংবেদনশীলতার সংযত গভীর মর্মস্পর্শিতা অনুধাবন করতে ঢোঁড়াই ছাড়া বিকল্প নেই। (অরবিন্দ, ২০০২ : ১৮)

আসলে গান্ধী মিথের সার্থক ব্যবহার এই উপন্যাসে সমষ্টিমানসের রূপায়ণে গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে। তাদের প্রতি অবহেলা, শোষণ, বঞ্চনা এবং সমাজবিন্যাসে শ্রেণিস্বার্থের বোধ ঢোঁড়াইয়ের মনে জাগিয়ে তুলেছে এই মিথ। যে ঢোঁড়াই গান্ধীর সর্বময়তায় বিশ্বাসী ছিল, তার কাছে ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞ-পরবর্তী রিলিফ বিতরণের অসাম্য নতুন দৃষ্টির উন্মোচন ঘটায়। নিঃসঙ্গ ঢোঁড়াইয়ের মনে বিতৃষ্ণা তৈরি হয়; বিকর্ষিত হয় গানহীবাওয়ার কাছ থেকে তার মন।

সতীনাথ ভাদুড়ী তাৎমাটুলিতে বসবাসকারী ঢোঁড়াইকে উপন্যাসের প্রথম চরণে তার সামাজিক প্রত্যয়সহ তুলে ধরেছেন বিশ্বস্ত ও আন্তরিকতার সঙ্গে। একেকটি সামাজিক কুসংস্কার, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ঢোঁড়াই গান্ধীর আকর্ষণে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের মূল স্রোতে উঠে এলেও মর্যাদায় সে নিম্নবর্গের সমাজ-পরিসরেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। সমালোচক বিপ্লব মাজী বলেন :

> ঢোঁড়াইকে একদিকে নিজের নিম্নবর্গের অনুশাসনের বেড়া ভাঙতে হচ্ছে, যেখানে নানা কুসংস্কার, ট্যাবু, অলৌকিক ধ্যান ধারণা, অন্ধবিশ্বাস পাথরের মতো অনড়; অন্যদিকে উচ্চবর্গ থেকে যেসব ধ্যানধারণা, উপাদান সে গ্রহণ করছে তার প্রভাব, নিয়ত তাকে এক পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে নিয়ে যাচ্ছে। উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মিলন ও দ্বন্দ্বকে সতীনাথ ভাদুড়ী এ উপন্যাসে আশ্চর্যভাবে ধরেছেন। এখানে কৌম চেতনা ও শ্রেণি চেতনা উভয় চেতনাই ঢোঁড়াইয়ের মধ্যে কাজ করছে। (বিপ্লব, ২০১৭ : ৬৬)

উপন্যাসে ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের রাজনৈতিক চৈতন্যের উদ্বোধন ঘটেছে দ্বিতীয় চরণে। এ পর্যায়ে শাসকবর্গের রাজনৈতিক কূটকৌশল, কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তার কাছে হয়ে উঠেছে স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। ঢোঁড়াইয়ের উত্থানের অন্যতম প্রেরণাভূমি হয়ে উপন্যাসে যে গান্ধীর আবির্ভাব ঘটেছে, পরিশেষে সেই গান্ধীর অনুসারী ব্যক্তিবর্গের মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সে বিচলিত হয়ে ওঠে। জীবনের সব আশা ব্যর্থ হওয়ায় সে সচেতনভাবে আত্মসমর্পণ করে কারাগারে। তবে ঢোঁড়াইয়ের ব্যর্থতাবোধ ও কারাগারে আত্মসমর্পণ করবার প্রকৃত তাৎপর্য অন্য জায়গায়। গোপাল হালদারের মতে,'সতীনাথ বুঝেছেন গান্ধী-আন্দোলনের উত্তর পুরুষ নেই। অন্তরের সততাতেই তিনি দেখেছেন–জনজীবন থেকে তা বিচ্ছিন্ন' (গোপাল, ১৯৭৮ : ৫৮)। অন্তেবাসী ভারতবর্ষের পরাহত নায়ক ঢোঁড়াই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন পর্বে সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত হলেও থেমে যায়নি। একঘেয়েমি, উদাসীনতা এবং বিতৃষ্ণাকে অতিক্রম করে ঢোঁড়াইয়ের দিব্যদৃষ্টি লাভ ঘটে। পরিণত ঢোঁড়াই উপলব্ধি করে :

> দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের নিচের শক্ত মাটি, তাতে দাঁড়িয়েও যেন নিশ্চিন্দি নেই। বদলায় অথচ বদলায় না। পুরনো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ২৩৮)

ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে বসে এই ভাঙনের দৃশ্য পরিপূর্ণভাবে দেখে নিতে সমর্থ হয়েছেন সতীনাথ ভাদুড়ী। ফলে নিম্নবর্গ ঢোঁড়াই প্রতিবাদী হয়েছে বিপর্যস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রশাসকের বিরুদ্ধে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে লেখক দেখিয়েছেন, নিম্নবর্গের মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগে তারা ধূর্ত রাজনীতিবিদদের হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাদের ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায় লাডলীবাবুর মতো উচ্চবর্গের শোষক শ্রেণি। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি বাবদ এক পয়সাও সাহায্য পায় না কোয়েরীটোলার জনসাধারণ, সব রিলিফ চলে যায় রাজপুতটোলায়। সতীনাথ রাজনীতির সংস্রবে একদশক জীবন অতিবাহিত করে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন কংগ্রেসের একদল সুবিধাবাদী স্বার্থসর্বস্ব নেতাদের নিজেদের সুখের সম্পদের রামরাজ্য গড়ার অপতৎপরতা। উদার ও মানবতাবাদী লেখক রাজনীতির নামে এই ভণ্ড নেতাদের কর্মকৌশল মেনে নিতে পারেননি।

এ উপন্যাসে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই ঢোঁড়াইকে সৃষ্টি করেছেন সতীনাথ, তাই তাকে তিনি নির্দিষ্ট কোনো সমাজের কিংবা শ্রেণির মানুষ হিসেবে দেখাতে চাননি। রামায়ণের আদলে লেখা হলেও এ উপন্যাসে ঢোঁড়াইয়ের প্রতিপক্ষ হিসেবে কোনো চরিত্র আবির্ভূত হয়নি। ফলে ঢোঁড়াই কার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তা অস্পষ্ট থাকে আমাদের কাছে। কোন আবেগ থেকে নিম্নবর্গের ঢোঁড়াই গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ক্রান্তিদলে যোগ দেয় তার সূত্রসন্ধানও বেশ জটিল। নিজের দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ঢোঁড়াই এ দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারেনি। আসলে এ উপন্যাসে সমকালীন ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীদর্শনকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গের প্রত্যাশা এবং কংগ্রেসের মধ্যে সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ও আধিপত্য বিস্তারের ফলে নিম্নবর্গের প্রত্যাশাভঙ্গের বিষয়টি ঢোঁড়াই চরিত্রের মাধ্যমে সতীনাথ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাই ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঢোঁড়াই নিজে বদলে গেলেও, বদলাতে পারেনি তার সমাজব্যবস্থাকে। সমাজ ও ব্যক্তির পরস্পর নির্ভরশীলতার কথা ভুলে গিয়ে সতীনাথ ঢোঁড়াইয়ের মানসিক বিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরতে মনোযোগী ছিলেন, তাই উপন্যাসে ব্যক্তি ও সমাজের চলিষ্ণু সজীব সম্পর্কটি উপেক্ষিত হয়েছে।

ঢোঁড়াই চরিতমানস-এ সময় ও রাজনীতির পরিবর্তনশীল আবহে ঔপন্যাসিক শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের একক হয়ে ওঠার চিত্রই তুলে ধরেছেন। স্নেহবঞ্চিত ঢোঁড়াই প্রায় অনাথ হয়েও পায়ের নিচের ভিত খুঁজে পেয়ে ক্রমে সমষ্টির প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। লেখক ঢোঁড়াইয়ের মাধ্যমে মূলত প্রান্তিকের প্রকৃত আশ্রয়ভূমির অন্বেষণ করেছেন। রাজনীতির আবর্তে তার ব্যক্তি সমস্যা সামগ্রিক সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন :

> বদ্ধ সমাজের ঢোঁড়াই বারবারই ঘা দিয়েছে তার সমাজকে। তার জীবনটাই ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মূর্ত প্রমাণ। যে যুগের মধ্য দিয়ে সতীনাথ ঢোঁড়াইকে নিয়ে গেছেন সেই বিক্ষুব্ধ ও স্বপ্নময় যুগে শিক্ষিত মনের 'উদ্দীপনা'র চেয়ে অশিক্ষিত মনের

> 'জাগরণ' সতীনাথের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। এমন নিরক্ষর মানুষের চেতনায় সমাজ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসকে প্রতিফলিত করার কঠিন চেষ্টা শুধু বাংলা উপন্যাসে কেন, সাধারণভাবে উপন্যাসজগতেই অভিনব। (অরুণ, ১৯৯১ : ৫৩৯-৫৪০)

সতীনাথ রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখেছিলেন তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের দুস্তর ব্যবধান। ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিলেন এ ব্যবধান বৃদ্ধি স্বার্থান্ধ শ্রেণির অভিপ্রেত; যারা সমাজ বদলের শক্তিশালী হাতিয়ারটিকে অধিকার করে নিয়েছে। দলীয় আনুগত্য তাই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে উপহাসাস্পদ :

> দল কই, দলের লেজটুকুই তো আছে। সেইটুকুই তিড়িং বিড়িং করে লাফায় টিকটিকির খসা লেজের মতো, প্রাণটুকু বাঁচানোর উদ্দীপনায় লাফায়, না ভাবার লোকসানটা পুরিয়ে নেবার জন্যে লাফায়; মূল শিকড় কেটে গিয়েছে। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ২৯৯)

এমনকি দল-মত নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতাদের মেরুদণ্ডহীনতা, আত্মম্ভরিতা, অনুদারতার প্রতিও লেখক কটাক্ষ করেছেন এখানে। দৃষ্টান্ত :

> যে যত নিষ্ঠুর সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত বেপরোয়া সে তত ক্রান্তিকারী, যে যত মুখ খিস্তি করতে পারে সে তত ক্রান্তিকারী, আরও অনেক অনেক কাজ, হাবভাব থেকে দলের সাধারণ অশিক্ষিত সদস্যরা অন্যলোকের ক্রান্তির কাজে যোগ্যতার সম্বন্ধে বিচার করে। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৩০০)

সতীনাথ প্রকৃত অর্থেই সমাজ-সচেতন লেখক ছিলেন। বিশ্বাস করতেন অজ্ঞ অশিক্ষিত অথচ পরিশ্রমী মানুষের মধ্যেই আছে সমাজ বিকাশের বীজ। অথচ চলমান রাজনীতির কোনো ধারাতেই তিনি দেখতে পাননি সেই সমাজমনস্কতা। আলোচ্য উপন্যাসে ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের বিচিত্র জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেই সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে। যে অনগ্রসর সমাজজীবনের দুর্নিবার স্রোতে ভেসে ঢোঁড়াই উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে, সেই সমাজ ও জীবনের প্রতিটি পর্যায় তার কাছে শূন্যগর্ভ বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। বিহার জনজীবনের পারিপার্শ্বিকতায় সতীনাথ যেমন দেখেছিলেন এখানকার মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তেমনি অনুসন্ধান করেছিলেন তাদের উত্তরণের পথও। অনুধাবন করেছিলেন কেবল ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতায় সতীনাথ পর্যবেক্ষণ করেছেন কোনো ভেদবুদ্ধি নিয়ে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সুস্থ সমাজজীবন চলে না। পারস্পরিক সদ্ভাব, সম্প্রীতি, সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমেই সমাজ এগিয়ে চলে। তাই একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সতীনাথ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায়গুলো ঢোঁড়াই চরিত্রের ভেতর দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তি ও সমাজের প্রবহমান সম্পর্কটি আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনিগ্রন্থনে যেমন প্রযুক্ত তেমনি বৃহত্তর রাজনীতির গতিচিত্রও সমান্তরালে উপস্থাপিত এখানে। আঞ্চলিকতার ফ্রেম এবং লৌকিক রামায়ণ কাহিনির সন্নিবেশে সতীনাথ ভাদুড়ী প্রতীকী ব্যঞ্জনায়

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যক্তি ঢোঁড়াইয়ের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে এ উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। ফলে উপন্যাসটিতে জনজীবনের বিস্তার আর ঢোঁড়াইয়ের ব্যক্তিজীবনের অন্তরঙ্গ সুখ-দুঃখ রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। তাই সমাজসত্যে অন্বিত ব্যক্তি-মানুষের সংগ্রামমূলক জীবনকাহিনি সতীনাথের রাজনৈতিক ভাবনার সঙ্গে একীভূত হয়েছে।

টীকা

১. ‘পঞ্চায়েতের মোড়লকে বলে ‘মহতো’। চারজন মাতব্বরকে বলে ‘নায়েব’। আর যে ‘লুটিস’ তামিল করে, আর লোকজনকে ডেকে ডুকে নিয়ে আসে তার নাম ‘ছড়িদার’। মহতো আর চারজন নায়েব পঞ্চায়েতে থাকে পাঁচজন, ‘পঞ্চ’। (শঙ্খ ও নির্মাল্য, ১৪১৯ : ৪)

গ্রন্থপঞ্জি

অরবিন্দ সামন্ত (২০০২)। *সাহিত্যের ইতিহাস কিংবা ইতিহাসের সাহিত্য*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

অরুণ সান্যাল (সম্পাদিত) (১৯৯১)। *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস*, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা।

অশ্রুকুমার সিকদার (২০১১)। *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

উদয়শংকর বর্মা (২০০৮)। *উপন্যাসের অন্য ভুবন*, কবিতীর্থ, কলকাতা।

গোপাল হালদার (১৯৭৮)। *সতীনাথ ভাদুড়ী : সাহিত্য ও সাধনা*, অয়ন, কলকাতা।

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা) (২০০২)। *বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, (২০১১)। *প্রসঙ্গ : ঢোঁড়াই চরিতমানস*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা।

বারিদবরণ চক্রবর্তী (১৯৯১)। *বাংলা কথাসাহিত্যে বিহারের লোকজীবন*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

বিপ্লব মাজী (২০১৭)। *দলিত আদিবাসী ও নিম্নবর্গের সাহিত্য*, কোডেক্স, কলকাতা।

মননকুমার মণ্ডল (২০১৪)। *আধুনিক বাংলা উপন্যাস : ব্যষ্টি ও সমষ্টি*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদিত) (১৪১৯)। *সতীনাথ রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১২)। *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুবল গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৩৭৯। *সতীনাথ স্মরণে*, ভারতী ভবন, পাটনা।

স্বস্তি মণ্ডল (১৯৮৫)। *সত্যসন্ধানী সতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী ও ঢোঁড়াই চরিতমানস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

হাসান আজিজুল হক (১৯৮৯)। *কথাসাহিত্যের কথকতা*, একুশে, ঢাকা।

পত্রিকা

দেশ (সম্পা.অমিতাভ চৌধুরী), ‘ঢোঁড়াইয়ের খোঁজে’, শীর্ষক প্রবন্ধ; রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা।